নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৪, পৃঃ১১০-১২৪
©১৯৯৯ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীঃ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে

অবন্তী হারুন*

১.১. ভূমিকা

একটি প্রথাগত গবেষণার মধ্য দিয়ে এক বা একাধিক বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু গবেষণার বাইরেও পাওয়া যায় এমন অনেক বিষয়কে সন্নিবেশিত করাটাও অনেক সময় প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে, তা হতে পারে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা পর্যবেক্ষণ বা অন্য কিছু। হয়তো তা কখনই গবেষণাকর্মের সমকক্ষ নয়, কিন্তু পরবর্তী কোন গবেষণার দিক নির্দেশনা দিতে বা বিশেষ কোন বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে তা সম্পূরক ভূমিকা পালন করতে পারে। মূলতঃ এই ভাবনাকে মাথায় রেখেই এই প্রবন্ধে মাঠকর্মকালীন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীদের একটি খসড়া চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে, এবং সেসাথে নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও গবেষকের ভূমিকা সম্পর্কে প্রবন্ধকারের নিজস্ব উপলব্ধি তুলে ধরা হয়েছে।

১.২. নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ ও গবেষকের ভূমিকা

মাঠকর্ম নৃবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয়। কেননা, নৃবিজ্ঞানের মৌলিক তথ্য ও উপাত্তসমূহ কোন গবেষণাগার থেকে নয়, বরং বাস্তব সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে অনুসন্ধানের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় (Burgess 1990)। স্বভাবতঃই গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়াদি নৃবিজ্ঞান ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞানে নানাভাবে আলোচিত হয়েছে। সহজভাষায় বলতে গেলে, কোন বিশেষ প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজার প্রয়াসকে গবেষণা বলা যায়। সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সামাজিক জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাসার জবাব অনুসন্ধান করা হয়। সামাজিক গবেষণা হলো বিভিন্ন পদ্ধতির এক ধরনের সমন্বিত প্রক্রিয়া, যার সুষ্ঠু ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কাঙ্খিত বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে। এটি এমনই এক বিশেষ প্রক্রিয়া যার অব্যাহত উৎকর্ষ সাধনের জন্য অধ্যবসায়, ব্যক্তিগত একাত্মতা, বিভিন্ন প্রতিকূলতায় ধৈর্যশীলতা, মিথস্ক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত দক্ষতা প্রয়ো গবেষণাকে এক বিশেষ জটিল প্রক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে তাত্ত্বিকেরা এর বিভিন্ন পর্যায় উল্লেখ করেছেন। যেমন Bernard (1990:111) বলেন, প্রথমতঃ তাত্ত্বিক সমস্যা নির্ধারণ, দ্বিতীয়তঃ যথোপযোগী গবেষণা ক্ষেত্র ও গবেষণা পদ্ধতি নির্বাচন, তৃতীয়তঃ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, এবং পরিশেষে যে তাত্ত্বিক প্রস্তাবনার মধ্য দিয়ে গবেষণার সূত্রপাত্র হয় তা সমর্থন নতুবা প্রত্যাখান, ইত্যাদি পর্যায়ে গবেষণাকে বিভক্ত করা যেতে পারে। এভাবে অন্যান্য

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট

তাত্ত্বিকেরাও গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে অন্যতম আলোচিত জিজ্ঞাস্য বিষয় হলো - এ ধরণের পর্যায়ক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ ব্যতিরেকে গবেষণা সম্ভব কিনা?

সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণাকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের গবেষণার পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত করার কথা অনেকেই বলেছেন। বিশেষ করে positivist-রা মনে করেন, পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের মত) অনুসরণ করেই সামাজিক বিষয়াদি উদঘাটন করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে গবেষক ও গবেষণাধীন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিশেষ মানবিক সম্পর্ক ও মিথস্ক্রিয়া সমাজবৈজ্ঞানিক গবেষণাকে সম্পূর্ণ আলাদা চরিত্র প্রদান করে তখন স্বাভাবিকভাবেই গবেষণা পদ্ধতিকেও একধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। যার ফলে, গবেষকের ব্যক্তিত্ব, মানসিক চাপ, প্রচ্ছন্ন স্বাজাত্যবোধ এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতা গবেষণার বাস্তব বিবেচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায় (Ellen 1993)। দেখা গেছে, অনেক এথনোগ্রাফিক বর্ণনাতে ব্যক্তিগত উপাদানগুলো উপেক্ষিত থেকেছে। গত বিশ বছর ধরে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে নৃবিজ্ঞানীর সাবজেকটিভ ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে (Roberts 1990)। অন্যদিকে নারীবাদী গবেষকদের কেউ কেউ সনাতনী গবেষণাপন্থায় এক ধরনের আধিপত্যবাদের ছায়া দেখতে পান। গবেষণাধীন ব্যক্তির সাথে গবেষকের বিচ্ছিন্নতা (disengagement), যা কেউ কেউ গবেষণার বস্তুনিষ্ঠতার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করেন, সেটাকে Oakley (*) এক ধরনের পুরুষবাদী (musculine) প্যারাডাইম বলে চিহ্নিত করেন। তিনি তিনটি কারণে এধরনের বিচ্ছিন্নতাকে নিরুৎসাহিত করেছেন। প্রথমতঃ এটি একধরণের শোষণমূলক (exploitative) প্রক্রিয়া। দ্বিতীয়তঃ নারীবাদী গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে নারীদের বিভিন্ন ইস্যু ও অভিজ্ঞতাকে ধ্বনিত করা, যে কারণে গবেষকের সাবজেকটিভ ভূমিকা অত্যাবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। তৃতীয়তঃ নৃবৈজ্ঞানিক গবেষণার সনাতনী উদ্দেশ্য হচ্ছে একধরণের সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক (rapport) স্থাপন, কাজেই বিচ্ছিন্নতার অর্থ যদি হয় গবেষক কর্তৃক গবেষণাধীন ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তর না দেয়া কিংবা শুধুমাত্র গবেষকই প্রশ্ন করে যাবেন এবং উত্তর দাতা উত্তর দিয়ে যাবেন, তাহলে এ ধরনের একমুখী প্রক্রিয়াতে কখনোই প্রকৃত সৌহার্দ্য তৈরী হতে পারে না (Roberts 1990)। এভাবে বিভিন্ন বিবেচনার প্রেক্ষিতে গবেষকের সাবজেকটিভ ভূমিকা ও মাঠকর্মের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নৃবিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ।

১.৩. মাঠকর্ম-ভিত্তিক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপট

১৯৯৮ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত একটি গবেষণাদলের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের সাতটি জেলার বিভিন্ন থানার প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিলো। জেলাগুলো হচ্ছে টাঙ্গাইল, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, বগুড়া, সাতক্ষীরা, মেহেরপুর ও সিরাজগঞ্জ। প্রতিটি জেলায় ৬ থেকে ৮টি গ্রামে নির্দিষ্ট সংখ্যক গৃহস্থালী (household) থেকে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ

করতে হতো। পূর্ববর্তী একটি জরীপের ভিত্তিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য অনুসারে গৃহস্থালীগুলো নির্বাচন করা হয়েছিলো। গবেষণার উদ্দেশ্য ছিলো মূলতঃ পরিমাণগত তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ। নির্ধারিত উত্তরদাতা ও অন্যান্যদের সাথে প্রশ্নপত্রের বাইরে ব্যক্তিগত আলাপচারিতা এবং পর্যবেক্ষণের দ্বারা এমন অনেক বিষয় সম্পর্কে জানা গেছে যেগুলো উক্ত প্রশ্নপত্রে সন্নিবেশিত করা সম্ভব ছিলনা, কিন্তু পরিধি ও গভীরতার বিচারে নৃবিজ্ঞানের একজন শিক্ষার্থীর কাছে সেগুলো সব সময়ই আগ্রহোদ্দীপক।

২. গ্রামাঞ্চলের নারীদের একটি খসড়া চিত্রঃ বিষয় বিন্যাস

উল্লিখিত গবেষণার মাঠকর্ম, ব্যক্তিগত পর্যায়ের আলাপচারিতা, এবং পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে যেভাবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের নারীদেরকে জানতে পেরেছি, তাই নিম্নে আলোচিত হবে। এই জানা কোনো পরিকল্পিত গবেষণার ফলাফল নয়, বরং ব্যক্তিগত অনুসন্ধিৎসার প্রকাশ। মাঠগবেষণাকালীন সময়ে বহুবিধ বিষয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এখানে আলোচনা বিস্তৃত হবে নারীদের কর্মকান্ড (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড), বিয়ে ও বিয়ে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়াদি, মাতৃত্ব ও মাতৃত্ব-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়, শিক্ষা, সচেতনতা, বাহ্যিক অভিব্যক্তি (appearance) প্রভৃতি বিষয়কে ঘিরে।

২.১. উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে বাংলাদেশের গ্রামঞ্চলের নারীদের অংশগ্রহণ

এই অংশের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে নারীদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। আলোচিত বিষয়গুলো হলোঃ কৃষি ও অকৃষি মজুরী শ্রম, স্বনিয়োজিত (self-employed) উপার্জনমুখী কাজ, নিজস্ব বা পারিবারিক খামারের অংশগ্রহণ। এছাড়া অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অংশগ্রহণ এবং শ্রমবিভাজন বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সামাজিক ব্যবস্থার কারণে কৃষি ও অকৃষি মজুরী শ্রমে নারীদের অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম। আমার অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয়েছে, যেখানে দারিদ্র্য প্রকট, সামাজিক মূল্যবোধগুলো সেখানে তুলনামূলকভাবে শিথিল বা কিছুটা ভিন্ন অর্থ বহন করে। যেমন, বাংলাদেশের সর্বাধিক দরিদ্র এলাকাগুলোর অন্যতম কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়। যেখানে লক্ষ্য করা যায়, কৃষি ও অকৃষি মজুরী শ্রমে নারী ও পুরুষকে অংশগ্রহণের অনুপাত প্রায় সমান সমান। সুতরাং প্রশ্ন উঠতে পারে, দারিদ্র্যের প্রভাব কম বলেই কি অন্যান্য অঞ্চলে নারীদের অংশগ্রহণ কম? নাকি পর্দা প্রথা বা সামাজিক বিধি নিষেধের কড়াকড়ি কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়ে অপেক্ষাকৃত শিথিল বলে নারীদের অংশগ্রহণ বেশী? অনুমান করা যেতে পারে, যেখানে দারিদ্র্য অতটা প্রকট নয় এবং পুরুষদের মোটামুটি কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে, সেখানে পর্দা প্রথা বা সামাজিক বিধিনিষেধ অপেক্ষাকৃত কঠোর। বস্তুতঃ বাস্তব প্রয়োজনই মূল্যবোধের নির্ধারক।

কৃষি মজুরী শ্রম

কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়ে যখন গবেষণা হয় তখন ছিলো ফাল্গুন মাস। সে সময় একদিকে ধান প্রক্রিয়াজাতকরণ ও অন্যদিকে নতুন চারা রোপণের বিভিন্ন কাজ চলছিলো। উভয়কাজেই নারীদের পর্যাপ্ত অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে ধান প্রক্রিয়াজাত করণ এর বিভিন্ন পর্যায় যেমনঃ ধান মাড়াই, ধান সিদ্ধ করা, শুকানো, মাড়াই ইত্যাদি কাজে নারীদের অংশগ্রহণই বেশী। আবার মাঠেও পুরুষদের সাথে দল বেঁধে চারা রোপনের কাজ করতেও তাদের দেখা গেছে। তাঁরা বছরের অন্যান্য সময়ে আগাছা পরিষ্কার করা, নিড়ানী দেয়া, ফসল কাটার কাজও করেন বলে জানা গেছে।

মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় তা হলো বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পুরুষদের মজুরী চুক্তিভিত্তিক (যেমন, এক মৌসুমে মাঠে কাজ করলে অত মণ ধান বা এই পরিমাণ টাকা পাওয়া যাবে) এবং অর্থের দ্বারা মজুরী প্রদান করা হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে মজুরী নির্ধারিত হয় দিন ভিত্তিতে এবং মূলতঃ ফসলের দ্বারা মজুরী প্রদান করা হয়। যেমনঃ বেশীরভাগ মহিলা দিন শেষে এক থেকে দেড় সের পরিমাণ চাল ও এক বেলা খাবার পান। কখনও কখনও নগদ অর্থও দেয়া হয়, তবে তা ঐ পরিমান চালের দামেই যা বিভিন্ন মৌসুমে ওঠানামা করতে পারে। একই ধরণের কাজে মজুরী প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ নারী পুরুষে বৈষম্য করা হয় না। তবে জমিতে চাষ দেয়ার সময় পুরুষরা বেশী মজুরী পায়।

পঞ্চগড়ে অনেক নিম্নবিত্ত হিন্দু পরিবার রয়েছে এ সমস্ত পরিবারে নারী কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী। এখানে বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চল থেকে আগত অনেক পরিবারও রয়েছে যারা বিভিন্ন কারণে (যেমন নদী ভাঙ্গন, পঞ্চগড়ে জমির দাম সস্তা থাকা ইত্যাদি) এখানে বসতি স্হাপন করেছে। এদের মধ্যে অনেক নিম্নবিত্ত রয়েছে। কিন্তু এ সব পরিবারের নারীদের কৃষিকাজে খুব একটা নিয়োজিত হতে দেখা যায়না। সম্ভবতঃ যে অঞ্চল থেকে তাঁরা আগত সেখানে নারী বাইরের কর্মকান্ডে অংশগ্রহণে বেশ সামাজিক কড়াকড়ি রয়েছে। এবং তা এখানেও ক্রিয়াশীল। তারপরও দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় উত্তর বঙ্গে কৃষি কাজে অধিকসংখ্যক নারী শ্রমিক নিয়োজিত আছেন।

মজুরী শ্রমিক হিসাবে সকল ধর্মাবলম্বী নারীরা নিয়োজিত থাকলেও তাঁদের অর্থনৈতিক অবস্হা এক নয়। এদেরকে অর্থনৈতিক অবস্হার প্রেক্ষিতে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ ১) ভূমিহীনঃ যাদের একেবারেই চাষযোগ্য কোন জমি নেই। এরা নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কৃষি ও অকৃষি মজুরী শ্রমে অংশগ্রহন করে থাকে। ২) ক্ষুদ্র জমি-মালিকঃ এদের স্বল্প পরিমান জমি আছে। এরা নিজের জমিতে কাজ করেন, আবার অন্যের জমিতেও কাজ করে থাকেন। ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণেও এরা অংশগ্রহণ করেন। কিছু কিছু ব্যতিক্রমী উদাহরণ রয়েছে। যেমনঃ টাঙ্গাইলের ভুয়াপুর থানার পলশিয়া গ্রামের হামেলা বেওয়া। তাঁর দুই-আড়াই বিঘা জমি আছে। প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র ও মজুরী শ্রমিক (পুরুষের) সাহায্যে তিনি জমিতে ধান গম ইত্যাদি চাষ করেন। কিন্তু বসতভিটা সংলগ্ন কয়েক

শতাংশ জমিতে তিনি নিজেই বিভিন্ন মৌসুমী শাকসব্জী পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি চাষ করেন। এগুলো তাঁর আয়েরও অন্যতম উৎস।

অকৃষি মজুরী শ্রম

অকৃষি মজুরী শ্রমের মধ্যে মাটিকাটা, কাঁথা সেলাই, তাঁতের কাজ, চিংড়ী ঘেরে কাজ ইত্যাদি উল্লেখ্য। যে সমস্ত অঞ্চলে মাটিকাটা কর্মসূচী চালু রয়েছে, সেখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও এতে অংশগ্রহণ করে। কুড়িগ্রাম পঞ্চগড় তো বটেই বগুড়া, মেহেরপুর এবং সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরেও নারীরা মাটিকাটার কাজ করে বলে জানা গেছে। এমনকি অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল বলে পরিচিত সাতক্ষীরাতেও মুসলিম নারীদের এতে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায় তবে হার তুলনামূলকভাবে কম। মাটিকাটা কর্মসূচীতে মজুরীর পরিমাণ সর্বত্র একই, তবে কোথাও কোথাও নারী পুরুষের বৈষম্য দেখা যায়।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কাঁথা সেলাই কোন প্রধান উপার্জনমুখী কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় না বরং তা হচ্ছে সাহায্যকারী উপার্জন। গৃহস্থালী কর্মকান্ডের বাইরে নিজের হাতখরচের জন্য, সন্তানদের আবদার মেটাবার জন্য বা বাড়তি আয়ের জন্য মহিলারা অবসরে কাঁথা সেলাইয়ের কাজ করেন। এক্ষেত্রে কাপড় সূতা সবই অন্যের সরবরাহকৃত। শ্রমিক শুধু শ্রম দেন। প্রধান পেশা নয় বলে নির্দিষ্ট কোন মজুরীর হার নেই। কাঁথার আকার বুঝে একেক জন একেকরকম মজুরী নেন । অপেশাদাররা বছরে দু'তিনটির বেশী কাঁথা সেলাই করেন না। পেশাদার যাঁরা তারা বছরে দশ বারটি পর্যন্ত কাঁথা সেলাই করেন। তাঁরা মোটামুটি মাঝারী আকারের কাঁকা প্রতি ৮০ টাকা থেকে ১৫০ টাকা পর্যন্ত মজুরী পান।

সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের তাঁত শিল্প বেশ বিখ্যাত। কিছু গ্রামে অধিকাংশ গৃহস্থালীর প্রধান উপার্জনের উৎস হচ্ছে পারিবারিক তাঁত উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে একাধিক তাঁতের সমন্বয়ে বড় কারখানা আছে। এ ধরণের তাঁত কারখানাগুলোতে মহিলারা সূতা ভরা, সূতা পাকানো, রং করা ইত্যাদি কাজ করেন। নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের নারীরা অন্যের তাঁতে একাজগুলো করেন মজুরীর বিনিময়ে। মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীরা নিজেদের পারিবারিক তাঁতে বিনা মজুরীতেই একাজগুলো করেন। খুব কম সংখ্যক নারীই তাঁত বোনার কাজ করে থাকেন । বগুড়াতে দামগড়া গ্রামে প্রায় সব পরিবারেই তাঁত দেখা গেলেও তাঁত শিল্পে মহিলা মজুরী শ্রমিক দেখা যায়নি।

সাতক্ষীরাতে রয়েছে প্রচুর চিংড়ী ঘের, এসব চিংড়ী ঘেরে প্রচুর নারী শ্রমিক নিয়োজিত আছেন। তবে এদের বেশীর ভাগই হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

মজুরী শ্রম হিসেবে মহিলাদের যে পেশাটি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য তা হলো অন্য গৃহস্থালীতে কাজ। সাধারণতঃ মহিলারা গৃহস্থালী কাজে দক্ষ হন এবং অন্যের গৃহস্থালীতে কাজ করার ক্ষেত্রে পর্দা 'লঙ্ঘন' হয় না বলে হয়েতো এটি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য পেশা। ঘরদোর ঝাড় দেয়া, ঘর লেপা-মোছা, কাপড় ধোয়া, বাসন ধোয়া, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল দেখাশোনা, রান্না-বান্না, ইত্যাদি গৃহস্থালী কাজে মজুরীর বিনিময়ে নারীরা অংশ নিয়ে থাকেন। সাধারণতঃ একাজের মজুরী হচ্ছে এক থেকে

দু'সের চাল এবং এক বেলা খাওয়া। যদিও কাজের সময় ও ধরণ অনুসারে মজুরীর পরিমাণ পরিবর্তিত হতে পারে।

সাধারণতঃ পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষের অনুপস্থিতির কারণেই মহিলারা মজুরী শ্রমে নিয়োজিত হয়। তবে তা সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। আবার অবিবাহিতাদের তুলনায় বিবাহিতারা বিশেষ করে বিধবা তালাপ প্রাপ্তা বা স্বামী পরিত্যক্তারা মজুরী শ্রমে অধিক অংশগ্রহণ করে বেশী।

অন্যান্য উপার্জনমুখী কর্মকান্ড

কৃষিক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ দু'ভাবে হতে পারে। এক দিকে মজুরী শ্রমিক হিসেবে কৃষি ক্ষেত্রে নারীরা অংশগ্রহণ করতে পারেন। অন্যদিকে বিনামজুরীতে নারীদের কৃষি কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহন রয়েছে। মজুরী শ্রমের বিষয়টি আগেই আলোচিত হয়েছে। এখানে অন্যান্য দিকগুলো আলোচনা করা হল।

উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে কুড়িগ্রাম ও পঞ্চগড়ে মেয়েদের কৃষি কাজে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এই দুই জেলায় দেখা গেছে নারীরা চারা রোপন, নিড়ানী দেয়া, আগাছা পরিষ্কার করা, ফসল কাটার কাজে নিয়োজিত থাকেন। ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণেও নারীদের ভূমিকাই প্রধান, দেশের অন্যান্য অঞ্চলের নরীদের মাঠের কাজে খুব বেশী দেখা না গেলেও ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণে তাঁদের ভূমিকাই উল্লেখ্য। এক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত নারীরা সকলেই সমভাবে অংশ নেয়।

অন্যান্য উপার্জনমুখী কর্মকান্ডের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হচ্ছে মাছধরা, তাঁত বোনা ইত্যাদি। সাতক্ষীরার শ্যামনগর থানার গবেষণাধীন কয়েকটি গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে খলপাটুয়া নদী। সমুদ্রের খুব কাছে হওয়ায় এই নদীর পানি খানিকটা লোনা। অপ্রশস্ত এই নদীটি দৃশ্যতঃ অগভীর । এই নদীটি এর তীরবর্তী গ্রামবাসীদের জীবন ও জীবিকার সাথে ওতোপ্রোতোভাবে জড়িয়ে আছে। ভোরে ও দুপুরের পর নদীতে যখন জোয়ার আসে তখন দেখা যায় বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষ হাঁটু পানি বা বুক পানিতে দাঁড়িয়ে জাল টানছেন মূল উদ্দেশ্য চিংড়ী পোনা ধরা। মূলতঃ মহিলা এবং বিভিন্ন বয়সের শিশু, কিশোর-কিশোরীরাই এতে অংশগ্রহণ করে।

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে সিরাজগঞ্জে, ও বগুড়ার একটি গ্রামে যেখানে তাঁত শিল্প বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে, মহিলারা বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত আছেন। বগুড়ার ঐ গ্রামে প্রায় সব মহিলাই পারিবারিক তাঁতে তাঁত বোনার কাজ করেন। অবশ্য এগুলো খুব ছোট তাঁত, মূলতঃ এখানে গামছাই তৈরী হয়। সিরাজগঞ্জের তাঁতগুলো অবশ্য বড়। তবে যাঁদের শ্রমিক নিয়োগের ক্ষমতা নেই সেই সব পরিবারের নারীরা তাঁতের কাজ করে থাকেন । এছাড়া তাঁতে সূতা ভরা, সূতা পাকানো, রং করা ইত্যাদি মেয়েদের কাজ বলেই পরিগণিত হয়।

গৃহস্থালীভিত্তিক আরেকটি উপার্জনমুখী কর্মকান্ড হচ্ছে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগী পালন। হাঁস-মুরগী পালনের ক্ষেত্রে মহিলাদের আগ্রহই প্রধান। অনেক সময় দেখা যায় বাড়ীর বালিকা বা কিশোরীর আবদারে একটি হাঁস বা মুরগী কেনা

হয়েছে। তবে উপার্জনের উৎস হিসেবে হাঁস-মুরগী পালন বা খামার তৈরীর ব্যাপারটি খুব একটা লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি যাঁরা বিভিন্ন এনজিও থেকে হাঁস-মুরগী পালন খাতে ঋণ নিয়ে থাকেন তাঁরাও নামে মাত্র দু'একটি মুরগী কিনে বাকী টাকা অন্য খাতে খরচ করেন। হাঁস-মুরগী পালনের ক্ষেত্রে যেসব যুক্তি দেওয়া হয় সেগুলে হচ্ছে, অসময়ে বা হঠাৎ কোন অতিথি (যেমন, মেয়ের শ্বশুরবাড়ীর কেউ) এসে পড়লে তাকে আপ্যায়ন করা যায়, ছেলে মেয়েদের মাঝে মাঝে ডিম খেতে দেয়া যায়, বা হঠাৎ কোনো আর্থিক সমস্যা হলে হাঁস-মুরগী বা উদ্বৃত্ত ডিম বিক্রি করে সাময়িক সমাধান করা যায়। দু'একটি বড় খামার দেখা গেলেও তা নিতান্তই অপ্রতুল।

গবাদি পশু-পালনের ক্ষেত্রেও বেশীরভাগ যুক্তিই অনুরূপ। অবশ্য শাহজাদপুরে বেশ কিছু বৃহৎ খামার দেখা গেছে। সেখানে পরিবারের মহিলারা তো কাজ করেনই, অনেক সময় মহিলাদের মজুরী শ্রমিক হিসেবেও নিয়োজিত হতে দেখা গেছে। মেহেরপুরে গবাদি পশু পালনের ক্ষেত্রে একটি মজার বিষয় পাওয়া গেছে। সেখানে সাত আটজন মহিলা মিলে একটি গরু পালন করেন। একেকদিন একেকজন খাবার দেন। দেখাশোনা করেন কম বেশী সকলেই প্রতিদিন দোহনকৃত দুধ একেকদিন একেকজন নেন। এভাবে চক্রাকারে প্রত্যেকে ৭/৮ দিন পর পর দুধ পান। বলা যেতে পারে মহিলারা নিজস্ব পদ্ধতিতে এক ধরনের সমবায় সমিতি চালু করেছেন।

মেহেরপুরে মহিলাদের কাউকে কাউকে দেখা গেছে চোরা চালানের সাথে যুক্ত আছেন। এরা মূলতঃ সীমান্ত পার হয়ে বিভিন্ন জিনিস, বিশেষতঃ শাড়ী নিয়ে আসেন এবং এখানে চড়া মূল্যে বিক্রি করেন।

এসব ছাড়া অন্যান্য উপার্জনমুখী কর্মকান্ডের মধ্যে দেখা যায় জামা-কাপড় সেলাই, ঘুঁটে থেকে জ্বালানী তৈরী ও বিক্রি, আচার বানানো ইত্যাদি। অনেকেই বলেছেন, সংসারের ছোট খাটো খরচ চালাবার জন্য সন্তানদের আবদার মেটাবার জন্য এসব কাজ করেন, যাতে স্বামীর কাছে সব সময় হাত না পেতে নিজেই চালিয়ে নেয়া যায়।

গৃহস্থালী কর্মকান্ড ও শ্রমবিভাজন

গৃহস্থালী কর্মকান্ডের সিংহভাগ মহিলাদেরই পালন করতে হয়। বাড়ী ঘর পরিষ্কার করা, ঘর লেপা-মোছা করা, রান্না, কাপড় ধোয়া, খুঁটে তৈরী , পানি আনা, জ্বালানী সংগ্রহ, শিশুদের দেখাশোনা ইত্যাদি বহুবিধ কাজে মহিলারা দিন ব্যাপী ব্যস্ত থাকেন। এছাড়া কৃষিজীবী পরিবারের ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ, তাঁতী পরিবারের তাঁতের কাজ এগুলোকে গৃহস্থালী কাজ হিসেবেই বিবেচনা করা হয়। অনেক সময় বাড়ীঘর তৈরী বা মেরামতের কাজেও মহিলারা সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। বগুড়ার খোট্রাপাড়া নামের একটি গ্রামে এরকম কাজে মহিলাদের দেখা গিয়েছিলো। একটি পুকুর সেঁচে ফেলা হয়েছে। অনেকেই সেখান থেকে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। পুকুর সংলগ্ন একটি বাড়ীর তিন বউ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে পুকুর থেকে কাদা তুলে তাঁদের চুলার চারপাশে দেয়াল নির্মাণ করছিলেন। তাঁদের বক্তব্য

ছিলো, ''পুরুষ মানুষ কি বুঝবে? তাদেরকে কয়েকবার বলার পরও গায়ে মাখেনি তাই আমাদের কাজ আমরাই করে নিচ্ছি''।

সাতক্ষীরার মোল্লাপাড়া গ্রামে বিশুদ্ধ খাবার পানির কোন উৎস ছিলো না, গ্রাম থেকে দু'মাইল দূরের একটি বিল থেকে পানি আনতে হতো, বিভিন্ন বয়সী মহিলারা দল বেঁধে চার মাইল হেঁটে খাবার পানি সংগ্রহ করতেন। এছাড়া অন্যান্য স্থানে যেসব বাড়ীতে বা বাড়ীর কাছে টিউবওয়েল আছে সেখানেও মহিলারাই পানি তোলার কাজ করেন।

গৃহস্থালী কাজে শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে তা মূলতঃ বয়স ও বৈবাহিক অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত । কখনও কখনও পরিবারের ধরণের উপরও তা নির্ভর করে। যেমনঃ একক পরিবারে পরিবারে প্রধানের স্ত্রী বা বাড়ীর প্রধান নারীই পরিবারের জন্য রান্না করেন। যৌথ পরিবারে একাধিক ভাইয়ের স্ত্রী থাকলেও সাধারণতঃ বড় ভাইয়ের স্ত্রীই সবার রান্না করেন। এছাড়া ঘর দোর-পরিষ্কার করা, গরু-ছাগল ও হাঁস মুরগী পরিচর্যা, ফসল, প্রক্রিয়া জাতকরণের কাজও মূলতঃ বাড়ীর বউরাই করে। বাড়ীর বালিকারা (১০-১২ বছর বয়সী) তাদের দেখা যায় শুকনো ডাল, ঝরাপাতা, ইত্যাদি জ্বালানী হিসেবে সংগ্রহ করে আনবে। আবার প্রয়োজনে মাঠ থেকে শাক পাতা সংগ্রহ, অথবা নদী কিংবা অন্য জলাশয় থেকে মাছ ধরে আনাও তাদেরই কাজ। বাড়ীর বাচ্চারা যেমন গরু ছাগল চরাতে নিয়ে যায়। তেমনি বাড়ীর বয়স্কা বা বয়ঃবৃদ্ধ মহিলারাও অনেক সময় গরু ছাগল চরানো বা অন্যান্য দেখাশোনার কাজ করে থাকেন। তুলনামূলকভাবে অবিবাহিতা কিশোরী ও তরুনীদের বরং কর্মহীন মনে হয়। তারা ছোট ভাইবোনদের দেখা-শোনা, পানি আনা, ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণের কাজ ও প্রয়োজনে রান্নায় সাহায্য করে থাকে।

২.২. বিয়ে ও বিয়ে সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়

বিয়ের সাথে জড়িত রয়েছে সামাজিক অবস্থান, মর্যাদা, আচরণ, সন্তান ধারণ মাতৃত্ব ইত্যাদি বহুবিধ বিষয়। নীচে এধরনের কিছু বিষয় আলোচনা করা হল।

বিয়ের বয়স

যে সমস্ত অঞ্চলে আমরা গিয়েছি প্রায় সবক্ষেত্রেই যে বিষয়টি চোখে পড়েছে তা হলো অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে বিয়ে হওয়া, সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গেছে মূলতঃ দশ থেকে সতের বছর বয়সের মধ্যেই অধিকাংশ মেয়েদের বিয়ে হয়ে যায়। অনেক মহিলাই বলেছেন, বিয়ের সময় তাঁদের ঋতু প্রাপ্তি ঘটেনি। বিয়ের বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হচ্ছে অর্থনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধ ইত্যাদি।

মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে সাধারণত অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হতে দেখা যায়। এর দু'টো কারণ বলা যেতে পারে - প্রথমতঃ বিয়ের খরচ ও যৌতুকের অর্থ জোগাড় করা ঐধরণের পরিবারের জন্য তেমন কোনো সমস্যা নয়। দ্বিতীয়তঃ ১৫-১৬ বছরের বেশী বয়স পর্যন্ত মেয়ে বিবাহিত থাকা পরিবারের মর্যাদা

হানিকর। অন্যদিকে বিয়ের ও যৌতুকের টাকার অভাবই নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েদের বিয়ে হবার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতার কারণ।

'শিক্ষা' কখনও কখনও বিয়ের বয়স নির্ধারণের নিয়ামক হলেও, 'শিক্ষা' বিষয়টিও বিত্ত এবং পারিবারিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ভুয়াপুরের হামেলা বেওয়ার মেয়ে মনোয়ারা মনোয়ারার বড় ভাই চায় তাকে বিয়ে দিতে। ভাইয়ের বক্তব্য হলো, ''দিন দিন বয়স বেড়ে যাচ্ছে, যত বয়স বাড়বে বিয়েতে ততবেশী টাকা দিতে হবে।'' মনোয়ারার মা অবশ্য মেয়েকে পড়াতেই আগ্রহী। তিনি বললেন, ''লেখাপড়া জানা মেয়ের বিয়ে না হলেও চলবে।'' এই ব্যাপারে ঝগড়া করে মনোয়ারার ভাই এখন আলাদা থাকে। সাতক্ষীরার হিন্দু প্রধান গ্রামগুলোতে দেখা গেছে অধিকাংশ মেয়েকে বাবা-মা অন্ততঃ এস, এস, সি পাশ করাতে আগ্রহী, যে কারণে তুলনামূলকভাবে তাদের বেশী বয়সে অর্থাৎ ১৮-২০ বছর বয়সে বিয়ে হয়।

সাধারণভাবে অল্পবয়সী মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে, তার বহুবিধ কারণ রয়েছে। কোন কোন পরিবারে তা প্রচ্ছন্ন গৌরবের প্রকাশ, কোথাও বা প্রবীণ পরিবার প্রধানের শখের বাস্তবায়ন। যেমন, সাতক্ষীরায় আটুলিয়া গ্রামে ৮-৯ বছরের ছোট্ট একটি মেয়ের দেখা পাওয়া গিয়েছিল যার বিয়ে হয়েছে। তার চাচা জানান যে মেয়েটির দাদার শখ হয় যে নাতনীর সাথে আরেক নাতির বিয়ে দেবেন, তাঁর ইচ্ছাতেই এহ বিয়ে। কেউ বাধা দেয়নি কিনা প্রশ্ন করাতে উত্তর এসেছিল, ''আব্বার বয়স প্রায় ১০০ বছর। তার মরার আগের শখ। কে বাধা দেবে?'' লক্ষ্যণীয় যে, মেয়েদের কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ অনেকক্ষেত্রেই পুরুষরাই নেয় (যেমন মনোয়ারার ভাই), এবং নারীরা এক্ষেত্রে যে ভূমিকাই পালন করুক না কেন, সাধারণভাবে এটা বলা যেতে পারে যে পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধই এই প্রবণতার জন্য দায়ী।

বহু বিবাহ

বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই বহুবিবাহ প্রচলিত রয়েছে, যা ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে স্বীকৃত। তুলনামূলকভাবে হিন্দুদের মাঝে একজন স্ত্রী থাকাকালীন সময়ে দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণের হার কম। তবে বহুবিবাহ বলতে শুধুমাত্র পুরুষদের একাধিক বিয়েকেই বোঝায় না, বরং, আমার সীমিত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, গ্রামাঞ্চলে নারীদেরও একাধিক বিয়ে প্রচলিত রয়েছে। ত্রিশোর্ধ্ব কোনো মহিলা (মুসলিম) যদি কারও দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী হন, ধরেই নেয়া যেতে পারে এটি মহিলাটিরও দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম অবস্থায় এই বিষয়ে প্রশ্ন করতে গিয়ে বেশ খানিকটা দ্বিধাগ্রস্ত হতাম, পরে দেখা গেলো গ্রামাঞ্চলের নারীরা এসব বিষয়ে বেশ অকপটেই কথা বলেন। তুলনামূলকভাবে বগুড়া, শাহজাদপুর অঞ্চলে বহুবিবাহের হার বেশী।

বহুবিবাহের দু'টি ধরন দেখানো যেতে পারেঃ একজন স্ত্রী বর্তমান থাকার সময় এক বা একাধিক বিয়ে, এবং স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুতে কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদ হলে পুনরায় বিয়ে। দ্বিতীয় ধরনটিই অধিক প্রচলিত, বিশেষ করে মহিলাদের দ্বিতীয় বিবাহের ক্ষেত্রে। একজন মহিলা দ্বিতীয় বিয়ের কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে

বলেন, ''নিয়মের বিয়া একটা করা লাগেই।'' সম্ভবতঃ তিনি সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তার কথা বুঝিয়েছিলেন। প্রথমোক্ত ধরনের বিয়ে মূলতঃ পুরুষরাই করে, মহিলাদের একসাথে একাধিক স্বামীর সাথে সম্পর্ক সামাজিকভাবে অস্বীকৃত। অনেক পুরুষই দু'জন স্ত্রীকে একসাথে রাখেন, তবে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না, ঝগড়ার মধ্য দিয়ে দুই স্ত্রী চুলা ভাগ করে নেয়। মেহেরপুরে রাধাকান্তিপুর গ্রামে জানতে পেরেছিলাম এক পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের পনেরোজন স্ত্রী আছে।

প্রথম পক্ষের স্ত্রী যারা হন তাঁরা আমাদেরকে পেলেই দুঃখের কথা বলেন, ''আপা আমি কালো - তাই আবার বিয়ে করেছে।'' কুড়িগ্রামের লাইলি একজন রিকশাচালকের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। লাইলি জানায়, তাঁর স্বামী প্রথম স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করে তাকে (লাইলিকে) বিয়ে করতে চায়। লাইলি তখন সপ্তম শ্রেণীতে পড়তেন। তার স্বামী লেখা পড়াই জানেননা। লাইলির পরিবার বিয়ে দিতে অসম্মত হলে এসিড মারবে ও তুলে নিয়ে যাবে বলে ভয় দেখিয়ে বিয়ে করে। প্রথম দিকে স্বামীর সাথে সম্পর্ক ভালই ছিলো। এখন প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর সম্পর্ক ভাল হয়ে গেছে। গায়ের দাগ দেখিয়ে লাইলি বলেন, ''দুইজন মিলি আমাকে পিটে (পেটায়)।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকলে তাদের মধ্যে কলহ লেগেই থাকে। তার পরও কেন পুরুষরা একসাথে একাধিক বিয়ে করে? মেহেরপুরের সেই পাঁচ ভাইয়ের সবচাইতে বড় ভাইয়ের জ্যেষ্ঠ স্ত্রী বলেছিলেন, ''ওদের তো ছেলে মেয়ের চিন্তা নিতে হয় না, যত জ্বালা মায়ের। চিন্তা না থাকলে বিয়ে করবে না কেন?''

অন্যরকম উদাহরণও আছে, বগুড়ার দামগড়া গ্রামে একজন গৃহকর্তার বয়স ৭০, তার স্ত্রীর বয়স ৫৫ হবে। উভয়েরই দ্বিতীয় বিয়ে। প্রত্যেকেরই প্রথম পক্ষের এক ছেলে। দ্বিতীয় বিয়েতে কোন সন্তান হয়নি। কিন্তু দু'জনেই ঘরে দুই ছেলের ছবি দেখিয়ে বলেছেন, এই যে আমাদের দুই ছেলে।

২.৩. মাতৃত্ব ও সন্তান পালন

সাধারণ নাগরিক মূল্যবোধ থেকে 'মাতৃত্ব' বলতে যে বিষয়টি আমাদের ধারণায় কাজ করে, গ্রামাঞ্চলের মাতৃত্বের ধারণার সাথে তা অনেক সময়ই মেলে না। যেমন, সন্তানের মৃত্যুর বিষয়টি মায়ের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর। কিন্তু এর প্রকাশ সব সময় এক নয়। সমগ্র গবেষণায় অন্ততঃ ৫০০ জন বিবাহিতা মহিলার সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। বেশীরভাগেরই সন্তান মৃত্যুর ঘটনা আছে। এদের মধ্যে শুধুমাত্র একজন মহিলা সন্তান মারা যাবার বিষয়টি বলতে গিয়ে আবেগ প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে সন্তানের জন্ম ও মৃত্যুর বিষয়টিকে তাঁরা বেশ 'সহজভাবেই' নেন বলে মনে হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সন্তানের জন্মহার ও মৃত্যুহার দু'টোই এত বেশী যে অনেকে জীবিত ও মৃত সন্তানের জন্মসাল বলতে গিয়ে ধারাবাহিকতা রাখতে পারেন না।

মাতৃত্বের সাথে অধিকার বোধের যে ধারণা কাজ করে, সেটিও নাগরিক ধারণার চাইতে অন্য মাত্রার। যেমন, পিতার দ্বিতীয় স্ত্রীকে অনেকেই মোটামুটি

সহজভাবে নেয়। সাতক্ষীরার একটি বাড়ীতে একটি এস, এস, সি পরীক্ষার্থী মেয়ে আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলো। তার মা মারা যাওয়ায় বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। সেই দ্বিতীয় স্ত্রীকে যখন প্রশ্ন করা হলো, ''কতদিন ধরে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করছেন?'' তিনি সৎ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, ''ছয় মাস হবে, না রে?''

শাহজাদপুরে একজন মহিলা ছয়জন সন্তান নিয়ে সংগ্রাম করে বেঁচে আছেন। তাঁর স্বামী বেঁচে নেই। সন্তানদের মধ্যে চারজন স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর, যার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে। ছেলেমেয়েরা রয়ে গেছে দ্বিতীয় পক্ষের সাথে। একটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে, সে বললো, ''আমার নিজের মাতো অন্য জায়গায় বিয়ে করছে, মা বলতে এরেই চিনি। বকলেও মা, আদর করলেও মা।''

২.৪. শিক্ষা

শিক্ষার সাথে বিত্ত এবং ধর্মীয় সামাজিক মূল্যবোধ বিশেষভাবে জড়িত। নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতে মেয়েদের শিক্ষাগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধাণ বাধা অর্থনৈতিক অবস্থা, ফলে আগ্রহ থাকলেও অনেক সময় পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। উচ্চ মধ্যবিত্ত বা উচ্চ বিত্ত পরিবারেগুলোতে সাধারণতঃ অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন পড়াশোনা চালিয়ে নিতে পারে না, ব্যতিক্রম. যে দু'একটা নেই তা নয় তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিয়ের পর মেয়েদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চগড়ে একটি মেয়ে নবম শ্রেণীতে ওঠার পর তার বাবা পড়াশোনার খরচ বন্ধ করে দিয়েছে। মেয়ের মা স্বামীর সাথে ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের জানালেন যদি স্বামী টাকা না দেয়, তাহলে বাপের বাড়ীতে রেখে মেয়েকে পড়াবেন। ভুয়াপুরের হামেলা বেওয়ার মেয়ে মনোয়ারর কথা আবার বলি তার চাচারা চায় যে মাদ্রাসায় পড়ুক, কিন্তু মনোয়ারা ও তার মা চায় কলেজে পড়াশোনা তাই সে দু'টোরই রেজিস্ট্রেশন করেছে সে মাদ্রায় দশম শ্রেণিতে পড়ে আর স্কুলে নবম শ্রেণীতে। সাতক্ষীরা হিন্দু প্রধান গ্রাম গুলোতে মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের হার বেশী। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তারা বিয়ের পরও শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন।

নারীদের শিক্ষ্য গ্রহনের ক্ষেত্রে ন্যূনতম হলেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা, বিশেষতঃ ব্র্যাক স্কুল। প্রাইমারী স্কুলে না গেলেও ব্র্যাক স্কুলে অনেক মেয়েই শিক্ষা গ্রহণ করছে, সম্ভবতঃ এতে কোন খরচ হয়না বলেই। সাতক্ষীরা ভ্যানচালক জালালের বয়স ২২-২৩ এর বেশী নয়। তিনি জানালেন তাঁর স্ত্রী এবার উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন, স্ত্রীর আগ্রহে তিনিও পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছেন। ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে মেয়েদেরকে বেশী উৎসাহিত করার কথা শোনা গেলেও তা বিশেষভাবে চোখে পড়েনি।

২.৫. স্বাস্থ্য, পোশাক ও অভিব্যক্তি

গ্রাম্য নারীদের যে সৌন্দর্যের বর্ণনা গল্প উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া যায় বাস্তবে তা বিরল। অল্প বয়সে বিয়ে ও সন্তান ধারণ, কঠোর পরিশ্রম, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে

অজ্ঞানতা তাঁদের যাবতীয় লাবণ্য ও কমনীয়তা শুনে নেয়। আমার সমবয়সী অনেক নারীই যখন তাদের বয়স বলছিলো তাঁদের দেখে মনে হচ্ছিলো তার চাইতে অনেক বেশী। আবার তাঁরাও আমার বয়স বিশ্বাস করছিলেন না, কারণ এই বয়স পর্যন্ত অবিবাহিত থাকার কথা নয়।

অল্পবয়সে সন্তান জন্মদানের কারণে অনেক নারীই তাঁদের কমনীয়তা হারান, পাশাপাশি দারিদ্র্য ও কঠোর পরিশ্রম তাদের চেহারায় ছাপ ফেলে। পানিতে আয়রনের আধিক্য ও পান খাওয়ার অভ্যেসের ফলে বেশীরভাগ মহিলার দাঁতে কালো ছোপ কুড়িগ্রাম পঞ্চগড়ে শ্রমজীবী নারীদের ধূমপান করতেও দেখা গেছে। কোনো মহিলার ওজন ৫০ কেজি বা তার ওপর হলে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো। একজন নয় মাসের গর্ভবতী মহিলার ওজন ছিলো ৩৭ কেজি।

পোশাক আশাকের ক্ষেত্রে বেশ কিছু উল্লেখ যোগ্য বিষয় দেখা গেছে। যেমন হলুদ জমিনে পাড়ে লাল ছাপা-সর্বত্র অত্যন্ত জনপ্রিয় শাড়ী, বিশেষ করে সদ্য-বিবাহিতারা এটাই প্রায় পরে থাকে। এছাড়া সামগ্রিকভাবে উজ্জ্বল রং যেমনঃ লাল, নীল, হলুদ কমলা, সবুজ ইত্যাদি রং এর ছাপা শাড়ীর ব্যবহার বেশী আমাদের মধ্যবিত্ত নাগরিক মানসিকতা থেকে যেমন ভাবা হয় অপেক্ষাকৃত বয়স্করা হাল্কা রং এর শাড়ী পরে বেশী কিন্তু দেখা গেছে উজ্জ্বল ছাপা শাড়ী প্রায় সবাই পরে- মূল কারণ খরচ কম, পরে আরাম এবং ময়লা দেখা যায় কম।

সীমান্ত এলাকাগুলোতে ভারতীয় ছাপা শাড়ীই বেশী চলে, টাঙ্গাইল ও শাহজাদপুর তাঁতের জন্য প্রসিদ্ধ হলেও সেখানকার মহিলাদের ছাপা শাড়ীই বেশী পরতে দেখা যায়। তাঁতের শাড়ীকেও দেখা যায় উজ্জ্বল রং এর ব্যবহার।

গ্রামের মহিলারা যে অলংকারটি সবচেয়ে বেশী পরিধান করেন তা হলো নাক ফুল কারণ মনে করা হয় নাকফুল হচ্ছে এয়োস্ত্রীর ধারক (হিন্দু মুসলিম সবারই)। বিয়ের সময় মেয়ের শ্বশুর বাড়ী থেকে আর কিছু না হোক নাকফুল দেয়া হবেই। অবশ্য অবিবাহিত মেয়েরাও নাকফুল পরে- তবে বিবাহিতাদের জন্য তা বাধ্যতামুলক/অবশ্য সামর্থ অনুসারে)।

শীত ও শীতের শেষ সময়ে দেখা গেছে গ্রামের কিশোরী ও বালিকারা লিপস্টিক লাগিয়ে রেখেছে। সম্ভবতঃ ঠোঁটের শুষ্কতা রোধেই এই ব্যবস্থা এছাড়া হিন্দু প্রধান অঞ্চলগুলোতে তো বটেই, অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা যায় কিশোরীরা আলগা টিপ ব্যবহার করছে। কিশোরীদের কানে ছোট খাট দুল কুড়ি মালা ও পরতে দেখা গিয়েছে। বিবাহিতা মহিলারা সারাদিন কাজে কর্মে খুব ব্যস্ত থাকেন বলে বেশ খানিকটা অপরিপাটী থাকেন, তবে দুপুরের পর তাঁদের দেখতাম গোসল সেরে তেল দিয়ে চুল আঁচড়ে বেশ পরিপাটী হয়ে আছেন।

৩. উপসংহার

উপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামের নারীদের জীবনের বিভিন্ন দিক ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। অত্যন্ত বৃহৎ পরিসরে দেখা গ্রামাঞ্চলের নারীদের জীবনের সামগ্রিক চিত্র এতে তুলে ধরা হয়নি,

কেননা এটি কোন প্রথাগত গবেষণার ফলাফল নয়। দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন অঞ্চলের নারীরা বহুবিধ উপার্জনমুখী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছেন। গৃহস্থালীর কর্মকান্ডের দায়িত্বও প্রধানত নারীদের, যদিও বয়স ও বৈবাহিক অবস্থাভেদে দায়িত্বের বিভিন্নতা রয়েছে। এছাড়া বিবাহ, মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা থেকে দেখা যায় বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত ও অঞ্চলভেদে নারীদের জীবন ও বোধে যেমন বিভিন্নতা রয়েছে, তেমনই রয়েছে সাদৃশ্য। এ প্রবন্ধে যে সমস্ত উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে হয়তো সাধারণীকরণ করে বলা যায় যে, বহুমুখী আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত প্রতিকুলতার মধ্যেও গ্রামাঞ্চলের নারীরা তাদের নিজস্ব কৌশলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে অভিযোজন করেছে। তাদের এই প্রয়াস তাদের অবস্থান ও পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুনভাবে মূল্যায়নের দিক নির্দেশ করে। তবে এই মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে গবেষককে গবেষণার কৌশল এবং উদ্দেশ্য নিয়ে আরো ভাবতে হবে, যার কিছু ইঙ্গিত নীচে দেওয়া হল।

পূর্বানুমান বনাম বাস্তব অভিজ্ঞতা

নারীদের সচেতনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা সম্পর্কে কিছু পূর্বধারণা গবেষণাকালীন অভিজ্ঞতার আলোকে পাল্টাতে হয়েছে। যে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রটি গবেষণায় আমাদের পুরুষ সহকর্মীরা ব্যবহার করবেন তার নির্ধারিত উত্তর দাতা ছিলো পরিবারের প্রধান পুরুষ বা পরিবারের অন্য কোন পুরুষ সদস্য। উক্ত প্রশ্ন পত্রের বড় অংশ জুড়ে ছিলো জমিজমা ও কৃষি বিষয়ক প্রশ্নাদি। অনেক সময় পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে নারীরা উত্তর দিতেন। লক্ষ্যণীয় যে অনেক নারীই কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন যেমন- কৃষি উপকরণ ও শ্রম নিয়োগে কত খরচ হয়েছে, জমি ও ফসল ক্রয় বিক্রয়ে দর কত, লাভ ক্ষতির পরিমাণ কত ইত্যাদি বিষয়ে বেশ গুছিয়ে উত্তর দিতেন।

যাঁরা এনজিও কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী তারা অবশ্য অন্যদের চাইতে একটু বেশীই সচেতন থাকতেন, বিশেষ করে সমিতির সভানেত্রী, সেক্রেটারীরা।

গবেষণাকালীন সময়ে দেশে চালের দাম বেড়ে গিয়েছিলো প্রায় সর্বত্রই। মহিলারা বেশ ক্ষোভের সাথেই বলতেন, ''সরকার চালের দাম বাড়াচ্ছে কেন? আর কি ভোট পাবে?'' শাহজাদপুরের একজন গৃহবধু মন্তব্য করেছিলেন, ''গরীবের উন্নতি কে করবো? একজন স্বামীরে নিয়া নাচেতো, একজন বাপেরে নিয়া নাচে''।

গবেষণার একটি সময়ে আমাদের দলে নারী সদস্যের সংখ্যা ছিল অপ্রতুল, ফলে আমাদের পুরুষ সহকর্মীরা আমাদের প্রশ্নপত্রে সাহায্য করতেন। আমাদের ধারণা ছিলো বিশেষ কিছু প্রশ্ন যেমন জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে মহিলারা হয়েতো সাবলীলভাবে উত্তর দেবেন না। কিন্তু দেখা গেলো তাঁরা পুরুষ গবেষকদের সাথে বেশ নিঃসংকোচেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য বিষয়ে কথা বলেছেন। বিশেষতঃ সাতক্ষীরার হিন্দু প্রধান গ্রাম গুলোতে নারীরা ছিলেন দারুণ স্বতঃস্ফূর্ত।

প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু?

গবেষণার বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে অন্যতম হলো তথ্যদাতা কর্তৃক তথ্য গোপন করা বা বিকৃত করা। কিছু স্পর্শকাতর বিষয়ে অনেকে সহজে কথা বলতে চাইতেন না, আবার অনেকে সচেতনভাবেই ভুল তথ্য উপস্থাপন করতেন। মীর্জাপুরে মন্দিরাপাড়া গ্রামে একটি যৌথ পরিবারে একজন বৃদ্ধ পরিবার প্রধান তাঁর স্ত্রী ছেলে ও ছেলের বউ ছিলেন সদস্য আমরা গিয়ে দেখি ছেলের বউ অনুপস্থিত বাবার বাড়ীতে গেছে। সে কারণে বৃদ্ধা শ্বাশুড়ীকে আমি প্রশ্ন করছিলাম এরা আমার সহকর্মী (পুরুষ) প্রশ্ন করছিলেন বৃদ্ধ পরিবার প্রধানকে। আমার প্রশ্ন পত্রের এক জায়গায় জিজ্ঞাস্য ছিলো- পারিবারিক খামারের কাজে শ্রমবিভাজন। বৃদ্ধা আমাকে জানালেন, ''আমি কোন কাজই করি না মা-আমার ছেলের বউই সব কাজ করে, এমন বউ পাওয়া ভাগ্যের কথা। আমিতো বলি, আমি আমার নিজের মায়ের পেটে জন্মাই নাই, বউয়ের পেটে জন্মাইছি।''- প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে আমি ও আমার সহকর্মী ঐ বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে কথা বলছিলাম। সহকর্মী জানালেন পুরুষদের জন্য নির্ধারিত প্রশ্নপত্রে সারা বছরের যাবতীয় খরচ লিপিবদ্ধ করতে হয়। উক্ত পরিবারে বিশেষভাবে পাওয়া গেছে 'মামালা-মোকদ্দমা'র খরচ। মামলা করেছে পুত্রবধূ শ্বশুর-শ্বাশুড়ীর বিরুদ্ধে, নির্যাতনের। পাল্টা মামালা করেছেন 'শ্বশুর'- বউকে 'চোর' সাব্যস্ত করে - এখন জোর মামলা চলছে। আমরা তখন শ্বাশুরী আর শ্বশুরের বক্তব্য মিলিয়ে 'থ'।

গবেষক-গবেষিত সম্পর্কের বহুমাত্রিকতা

গবেষণাকালীন সময়ে গ্রামের মহিলাদের সাথে কথা বলতে গিয়ে অনেকের মধ্যে এক ধরনের রসিকতাবোধ লক্ষ্য করেছি, যা আমাকে খুব আকর্ষণ করেছে। যেমন প্রশ্নপত্রে জিজ্ঞাস্য ছিলো, ''এ সপ্তাহে কি কি সব্জী খাওয়া হয়েছে'' - এবং তা 'কেনা' না কি বাড়ীর। মেহেরপুরের একজন মহিলা বললেন, পটল খেয়েছেন এ সপ্তাহে। তা কিনে খাওয়া কিনা জিজ্ঞেস করতেই তিনি বললেন, ''তোমার শ্বশুর কি আমাকে পটলের চারা দিয়ে গেছে যে বাড়ীরটা খাবো?'' মেহেরপুরের মহিলারা বোধ হয় স্বভাবগুনেই রসিক। একজনকে বলেছিলাম, ''চাচী আজ কি রান্না করবেন?'' উত্তরে বললেন, ''সে কি আমি বলতে পারি? বাজারে কি মাছ পাওয়া যাবে? না আমি বললেই সেই মাছ নিয়ে আসবে?''

মহিলারা অনেকেই ছিলেন বেশ নিঃসংকোচ, জন্মনিয়ন্ত্রণ বা এ জাতীয় বিষয়ে কথা বলার ক্ষেত্রে তাঁরা বেশ সাবলীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও বেশ মজার, এবং আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ধারণার অনেক বাইরে। মেহেরপুরে এক দোকানদার আমাদের হাতে ওজন মাপার যন্ত্র দেখে বললেনে, ''আপা, আমাদের মাপ নেবেন না?'' আমার তথ্যদাতা মহিলাটি আমার সংগেই ছিলেন, চেঁচিয়ে বললেন, ''কেন তোমার রূপ যৌবন কি বেশী হয়েছে?'' পরে জানা গেলো ঐ ব্যক্তি মহিলার গ্রাম সম্পর্কে ভাসুর।

গবেষিতের চোখে গবেষক ও গবেষণা

গবেষণাকালীন সময়ে আমার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তো প্রশ্ন থাকতই। যেমন বাড়ীতে কে কে আছে, কতটুকু পড়াশুনা করেছি, চাকুরীতে বেতন কত পাই ইত্যাদি, সবচাইতে বেশী প্রশ্ন করতেন ''বিয়ে নিয়ে''। অনেক সময়ই আমাকে মহিলারা প্রশ্ন করতেন ''তোমার তো বিয়ে হয় নাই না আপা?'' - তাঁরা বুঝতেন যেহেতু নাকে ফুল নেই তারমানে আমি অবিবাহিত। অনেক সময় এও বলতেন, ''ছোটকালে নাক ফুটা করনি, বিয়ের সময় ফুটো করতে গেলে মেলা কষ্ট হবে।'' অনেকে আবার ভাবতেন ''কেন যে বিয়ে হয় না, সবই আল্লাহর হুকুম!'' অপেক্ষাকৃত বয়স্কা মহিলারা আদিরসাত্মক রসিকতাও করতেন।

একটি গ্রামে দু'তিন দিন গেলে সবার প্রাথমিক কৌতূহল মিটে গিয়ে এক ধরণের সখ্য তৈরী হতো, এতে তাঁদের আন্তরিকতাই থাকতো বেশী। তারা যে কী অবলীলায় আমাদের কাছে টেনে নিতেন তা ভাবা যায়না। যেমন একজন আমার কানের দুল কয়েকবার হাত দিয়ে নাড়াচাড়া করে বললেন - ''আপা এইটা আমারে দাও,'' অনেকটা অধিকার বোধের সুরে এই আবদার বেশ লাগতো। কুড়িগ্রামের লাইলি বললেন, ''আপা একটা চিহ্ন দিয়ে যাও।'' তখন দেয়ার মত তেমন কিছুই ছিলো না। তিনি বললেন, ''চুলের ব্যান্ডটা খুলে দিয়ে যাও।'' তাঁদের এই সারল্য, আন্তরিকতা আর বন্ধুত্ব কখনই ভোলার নয়।

গবেষণাকালীন সময়ে আরও বহুবিধ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেও তাঁদের প্রধানতম জিজ্ঞাসা ছিলো, 'আপা এই সব লিখে নিয়ে আমাদের কি কোন লাভ হবে?' তাদের লাভ হবে কিনা তা বলা যায়নি নিশ্চিত করে। তা সত্ত্বেও তাঁদের আতিথেয়তা ও আন্তরিকতার কোন ঘাটতি হয়নি, এমনকি আমাদের সহযোগি করতেও তাঁরা কোন রকম কার্পণ্য করেননি।

তথ্যসূত্র

Bernard, H. Russell (1990) *Research Methods in Cultural Anthropology*. Newbury Park: SAGE Publication.

Burgess, R. (1990) *In the Field: An Introduction to Field Research*. London : George Allen & Unwin

Ellen, R. F. (1993) *Ethnographic Research: A Guide to General Conduct*. [7th Edn.] Harcourt Brace & Company

Oakley (*) [...]

Roberts, H., ed. (1990) *Doing Feminist Research*. London: Routledge Kegan Paul.